দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 1 2 1999
পৃষ্ঠা 9 কলাম ৫

স্মৃতি

# গাজী শামছুর রহমান কাছ থেকে দেখা

## জিশান আরা আরাফুন্নেছা

তাঁকে ঘিরে অনেক কথা জমা আছে। কোনটা রেখে কোনটা বলব আর কোথা থেকে যে শুরু করব সেটাই ঠিক করতে পারছি না। তাঁর সাথে আমার নানারূপে নানা পরিচয়। কখনও তাঁকে পেয়েছি পরীক্ষকরূপে, কখনও তিনি প্রশিক্ষক, কখনও প্রিয় 'দেশী', আবার কখনও প্রিয়তম নানা। গত বছর ১২ আগস্ট আমার এক পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করলাম তাঁর চিরবিদায়ে। পত্র-পত্রিকায় তাঁর কয়েক দিন আগে থেকেই জেনেছিলাম তিনি অসুস্থ, বাঁচার আশা কম এ কোন হঠাৎ যাওয়া নয়। তবু মন বলে, তিনি আরও কিছুদিন তো থাকতে পারতেন। আরও কিছু লেখালেখিও করতে পারতেন; কিন্তু নিয়তির বিধান বোধহয় তাঁর জন্য এমনই ছিল; তাঁকে চলে যেতে হলো দেখতে দেখতে একটা বছরও গত হয়ে গেল।

তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএসসি'র ভাইভা বোর্ডে ঢোকার পর পরই মোটা কালো চশমাধারী একজন আমার নামটা বলে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তোমার নাম রেখেছেন কে?" আমি উত্তর দিতেই বললেন, "আমি সবসময় ভাবি আমার সন্তানদের আমি সুন্দর, নতুনত্বে ভরা নাম রেখেছি, কিন্তু তোমার বাবা দেখি আমাকেও বিট দিয়েছেন"; যাহোক এর পর চাকরি সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি বোর্ড থেকে বের হতে হতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম—তিনি আমার আব্বার প্রশংসা করেছেন।

এর পর বিসিএস পাস করে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ পেলাম ও শাহবাগে অবস্থিত তৎকালীন সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমীতে (কোটা) প্রশিক্ষণের জন্য যোগ দিলাম '৮৩'র এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। আইন ও প্রশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সুতরাং আইন বিশেষজ্ঞরা সব আসবেন আমাদের প্রশিক্ষক হিসাবে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দণ্ডবিধির ক্লাস শুরু হলো। গাজী শামছুর রহমানের দায়িত্ব শিক্ষানবিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের কণ্ঠের দণ্ডে বা গলাবাজির দাপটে দণ্ডবিধি রপ্ত করানো। এবার তাঁকে পেলাম প্রশিক্ষকরূপে। সে কি দোর্দণ্ড প্রতাপে আমাদের আইন শেখাতেন। তাঁর তুলনা অন্য কারও সাথে দেয়া সম্ভব নয়। তাঁর তুলনা শুধু তিনিই; তেইশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত দণ্ডবিধির ৫১১টি ধারার সব ক'টি ধারাই তাঁর কণ্ঠস্থ। সে সময়ে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ বন্ধ করে আইনের দুরূহ বিষয় সহজভাবে ব্যাখ্যা করার অতি পরিচিত জনপ্রিয় প্রতিচ্ছবিটি কোটার আইনের ক্লাসে একদম কাছাকাছি এসে পেলাম আমরা। সাবেত আর দবিরকে উদাহরণ হিসাবে কত চমৎকারভাবে আমাদের শেখাতেন তিনি। তাঁর প্রতিটি অধিবেশন শেষে (প্রশিক্ষণকালীন ক্লাসকে অধিবেশন বলাই যুক্তিযুক্ত) আমাদের পড়া ধরতেন। এক একজনকে স্টেজে তুলে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে পড়া বলাতেন; না বলতে পারলে যেমন অসন্তোষ প্রকাশ করতেন, তেমনি পড়া বলতে পারলে তা কোট করে অন্যকে বকা দিতেন, 'অমুক পারল আর তুমি পারবে না'। মনে পড়ে দণ্ডবিধির '৩২৬' ধারার অপরাধ কয়টি কারণে হতে পারে, তা আমাদের প্রত্যেককে ক্লাসে বসেই মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। কী চমৎকার তাঁর শিক্ষাশৈলী ছিল তা তাঁর সান্নিধ্যে আসা প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীই মনে করতে পারবেন। ঐ প্রশিক্ষণ চলাকালে একদিন পড়া বলা শেষে আমার বাড়ি কোথায় জানতে চাইলেন। 'খুলনা' বলাতে সেদিন থেকে আমি হয়ে গেলাম তাঁর 'দেশী'। এর পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই যেন একটু বেশি আপন করে নিলেন। অবশ্য তাঁর স্বভাবই ছিল সবাইকে কাছে টানা, অতি আপন ভাবা। সব প্রশিক্ষণার্থীকেই তিনি নাতি/নাতনি সম্বোধন করতেন। তাই তো গাজী শামছুর রহমান হয়ে গেলেন আমাদের কমন নানা—' প্রিয় নানা'।

প্রশিক্ষণকালে তাঁর অসংখ্য বলা কাহিনী, অনেক রসালো আবার অনেক হৃদয় বিদারক কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বলার লোভ সামলাতে পারছি না কারণ এগুলো তো গল্প নয়, জীবন থেকে নেয়া সত্য ঘটনা। একদিন তিনি এক এসডিও'র গল্প শুনিয়েছিলেন; যিনি ধনীর দুলালী স্ত্রীর 'সম্মান রক্ষার্থে' মাঝি বাবাকে 'Servant' বলে পরিচয় দিয়ে কিছু পয়সা দিয়ে অফিস থেকে বিদায় করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। ঐ বাবার কথা বলতে গিয়ে নানা ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমরা সব ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছ, কিন্তু ক্ষমতার দাপটে নিজের শিকড় যেন ভুল না কোনদিন'। আর এক দিন তিনি লিবিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া তাঁর মেয়ে-জামাই'র কথা বলে কী মর্মবিদারক কান্নাটাই না কাঁদলেন। সেদিন তাঁর মাঝে যে স্নেহময় পিতার পরিচয় পেলাম তা ভুলবার নয়।

অন্য এক দিন পড়ানোর ফাঁকে একটা মজার গল্প বলে আমাদের খুব হাসিয়েছিলেন। খুব মজা করে নিজের চেহারা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "আমি তখন প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। একদিন রমনা পার্কে মর্নিং ওয়াক করছি, এ সময় এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো, লোকটা একটা মফস্বল শহর থেকে কি এক প্রয়োজনে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছেন। আলাপচারিতায় প্রেস কাউন্সিলে চাকরি করি শুনে তিনি জানতে চান চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আমার কোথায়, কিভাবে দেখা হতে পারে। যা হোক, যথাসময় ঐ লোক এসে হাজির। কিন্তু চেয়ারম্যানের আসনে আমাকে দেখে তো অবাক আর তা তো হবেই। কারণ, "আমার চেহারা তো দারোয়ানের মতো, চেয়ারম্যানের মতো তো আর নয়।" আমরা তাঁর গুণমুগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁর এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করলাম বটে, কিন্তু মজা পেয়েছিলাম খুব। আরও একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে ভীষণভাবে। তাঁকে যাঁরা টেলিভিশনে দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়ার কথা নয়, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে কোন মামলা বা ঘটনার বর্ণনার সময় তিনি চোখ বুঁজেই বলে যেতেন। প্রশিক্ষণ অধিবেশনে ঠিক এমনটা করতেন। একদিন চোখ বন্ধ করার বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি উত্তরে জানালেন, যে সকল বক্তা খারাপ পড়ান, তাঁদের বক্তব্য শুনতে শুনতে নাকি শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়ে। 'আর আমি এতই খারাপ বক্তব্য রাখি যে, তোমাদের সাথে সাথে আমিও ঘুমিয়ে যাই'। বলাবাহুল্য, অন্তত গাজী শামছুর রহমানের অধিবেশনে ঘুমানোর মতো অবকাশ কেউ পেতাম না; মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তব্য শুনতাম। তবুও তাঁর জবাব শুনে খুব একচোট হেসেছিলাম আমরা সবাই; মজার ব্যাপার ছিল তিনি পড়াতে পড়াতে এমন টুকরো টুকরো দুই/তিন মিনিটের গল্প শুনিয়ে আবার মুহূর্তেই ফিরে আসতেন মূল বিষয়ে নিজ অবস্থানে। এগুলো ছিল আমাদের ক্লান্তি দূর করার টনিক। এ কৌশল আমাদেরকে তাঁর অধিবেশনগুলোতে চমৎকার আকর্ষণ করত। এভাবে দু'মাস কেটে গেল। আমরা প্রশিক্ষণ শেষে যে যার কর্মস্থলে চলে গেলাম। এর পর অনেক দিন মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি। ঢাকার বাইরে আমার চাকরি জীবনের প্রথম আট/নয় বছর কেটেছে।

এর পর ১৯৯২ সালে আবার তাঁর সাথে দেখা। ক্ষেত্র পর্যায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে তখন আমি পোস্টিং পেয়েছি শাহবাগস্থ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) একাডেমীতে। আমাদের প্রশিক্ষাকালীন কোটা'ই তখন এ নতুন নামে পরিচিত। তখন শুধু প্রশাসন আর পররাষ্ট্র ক্যাডার দু'টির অফিসারদের প্রশিক্ষণ হতো সেখানে। যাহোক, একাডেমীর অনুষদ সদস্য হিসাবে এবার কোর্স চালানোর দায়িত্ব চাপল কাঁধে। প্রশিক্ষণার্থী ম্যাজিস্ট্রেটদের দণ্ডবিধি শেখানোর জন্য যোগাযোগ করলাম গাজী শামছুর রহমানের সাথে। আর আমার যোগাযোগে সাড়া দিয়ে যখনই ডেকেছি তখনই তাঁকে পেয়েছি আমি। একাডেমীতে থাকাকালে আমি আইন বিষয়ক যত কোর্স সমন্বয় করেছি, তার সব কটিতেই দণ্ডবিধির পুরো বিষয়টা তাঁকে দিয়ে পড়িয়েছি। কোর্স সমন্বয়ক হিসাবে আমি যখনই তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছি, পেয়েছি। একই সময় দুই/তিনটা প্রোগাম থাকলেও তিনি আমারটাকেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। নিহায়ত জাতীয় পর্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান না থাকলে তিনি অন্য কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করতেন, আমারটা অপরিবর্তিত রাখারই চেষ্টা করতেন। এ আমার বড় পাওয়া ছিল তাঁর কাছে। আজ আমি শ্রদ্ধা ভরে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর এ স্নেহের কথা স্মরণ করি। এ সময় এক দিন পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি আমার প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন, "আচ্ছা, আমি মরে গেলে তোমরা আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে না?" আমার ভিতরটা কেমন যেন হাহাকার করে উঠল। অধিবেশন শেষে তাঁকে আমার অফিস চেম্বারে এনে বিশেষভাবে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলাম। বেশি পরিশ্রম করতে নিষেধ করলাম একান্তই আপনজনের অধিকার নিয়ে। হার্টের অসুখসহ আরও কিছু সমস্যা নিয়ে দেশে ও বিদেশে কিছুদিন তাঁর চিকিৎসা হলো। পত্র-পত্রিকায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর নিয়মিতই প্রকাশিত হতো। তারপর এক দিন সব শেষ হয়ে গেল। সেদিনটি ছিল বুধবার, ১২ আগস্ট ১৯৯৮ সাল। বাংলাদেশের এক আইন প্রতিষ্ঠানের তিরোধান হলো।

প্রকৃতই গাজী শামছুর রহমান এ দেশের আইনের জগতে একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। আইনের এমন কোন শাখা নেই যেখানে গাজী শামছুর রহমানের পদচারণা ঘটেনি। আইনের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ছোট-বড় প্রায় দেড় শ' পুস্তক রচনা করেছেন। আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই আইন শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন। আইনের ভাষা জটিল, দুর্বোধ্য এবং অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায়। এটি আমাদের কাছে বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য করেছেন তিনি।

গাজী শামছুর রহমান জেলা জজ, আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, পিআইবি ও প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং বাংলা একাডেমীর সভাপতি ছিলেন। আর আমাদের মতো শিক্ষানবিশ আইনের ছাত্রের কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, তিনি একজন সফল প্রশিক্ষক। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁর অগণিত প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সারা দেশে অসংখ্য ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্র আছেন। আমরা আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে সেই পরম করুণাময়ের কাছে একান্তেই তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করি। এ পারের মতো তাঁর ওপারের জীবনও সফল হোক—এটাই আজকের দিনে আমাদের চাওয়া।

# জজ চাচা

## হোসেন জামাল লাকী

দেখতে দেখতে আজ এক বছর হয়ে গেল! ভাবতে অবাক লাগে জজ চাচা নেই। যে লোক হার্টে ৩টা ব্লক নিয়ে বুলেটের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন সেই লোক ক্যান্সার নামক ব্যাধির কাছে কিভাবে হার মানলেন গত বছর ১২ আগস্ট?

১৯৭২ সালের কথা। জানুয়ারির গোড়ার দিকে সবে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বাংলাদেশ টেলিভিশনে যোগ দিয়েছি। তখনও জজ চাচার সাথে আমার সাক্ষাত হয়নি। তিনি থাকতেন সরকারী বাসায়। যদিও তাঁর নিজস্ব বাড়ি আমাদের পাড়ায়—আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র তিনটে বাড়ির পর। বাড়িটি তখন ভাড়া দেয়া ছিল।

জজ চাচা তখন আইন মন্ত্রণালয়ে যুগ্ম সচিব ছিলেন। আমাদের অফিসের কেউ যদি তাঁর দফতরে যেতেন তখন তিনি তাঁকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। বলতেন আমার ভাতিজা হয়। তাঁরা এসে যখন তাঁর কথা আমাকে বলতেন তখন আমি ভীষণ অবাক হতাম। না দেখে কেউ যে এমনভাবে আপন করে নিতে পারে তা আগে কখনও দেখিনি বা শুনিনি। তাঁদেরকে বলতাম একটু ভাবের সাথে যে, হ্যাঁ তিনি আমার চাচা।

পরে বাড়ি ফিরে আমার বাবাকে (মরহুম মোহাম্মদ মোদাব্বের) জিজ্ঞাসা করি যে ল ডিপার্টমেন্টে গাজী শামছুর রহমান বলে একজন আছেন যিনি আমার চাচা হন, আমার সব খবর রাখেন, তিনি কে? আমি তো কখনও দেখিনি? বাবা তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ তিনি তোমার চাচা, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁর স্ত্রী আমার বোন। তোমার সব কথাই তাঁকে বলেছি।

বেশ কয়েকদিন পর চাচা-চাচি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলেন। তখন তাঁকে স্বচক্ষে দেখলাম এবং বেশ ভালও লাগল তাঁকে। মনে হলো যেন অনেকদিনের চেনা অত্যন্ত আপন জন।

বাবা যেহেতু চাচিকে বোন ডাকতেন সেই সুবাদে ভগ্নিপতিকে ঠাট্টা করে বলতেন—তারপর নমশূদ্র সাহেব, কি খবর? কেমন আছেন? চাচাও তেমনি উত্তর দিতেন, যদি নমশূদ্র হই তাহলে এ অপাত্রে বোনকে কেন দিলেন? উত্তরে বাবা বলতেন, দিয়েছি আপনাকে জাতে তোলার জন্য। তার পর দু'জনে বেশ মজা করে আসর জমিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে পড়তেন; চাচা ছিলেন ভীষণ ভোজনবিলাসী। সে কথায় পরে আসছি।

আমার স্ত্রীকে চাচা ভীষণ আদর করতেন, তাকে ডাকনাম ধরে জোরে হাঁক দিতেন—খুকু তুমি কোথায়! ভীষণ খিদে পেয়েছে, কি খাবার খাওয়াবে শীঘ্র দাও।

খুকু তখন চাচার পছন্দমাফিক খাবার নিয়ে চাচাকে খেতে বলতেন, চাচা খেতে খেতে বলতেন, জানো খুকু লাকীর যদি আমার মতো টাকা থাকত তাহলে ও তোমাকে একটা হেলিকপ্টার কিনে দিত। চাচার কথা শুনে আমার স্ত্রী মুখ টিপে হাসত।

একেক জনের একেকটা শখ থাকে। চাচার ছিল ভাল খাবারের। পঞ্চব্যঞ্জনের সঙ্গে তাঁর ভাত খেতে হবে। তরকারি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে, তার পর আর ধোয়া যাবে না, সোজা চুলায়। এক কথায় চাচাকে পুষ্টি সচেতন ভোজনরসিক বলা যায়। চাচা নিজের পোশাকআশাকের জন্য যদি এক শ' টাকা খরচ করতেন সে ক্ষেত্রে পাঁচ শ' টাকা খরচ করতেন খাবারের জন্য। চাচার ছিল হার্টের অসুখ। সেই কারণে খাবারদাবারের ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু তিনি ওসবের ধার ধারতেন না। বাইরে বা বিয়ে বাড়িতে খাবার সময় যা সামনে আসবে তার সবই হালাল।

'৯১ সালে একবার বাংলা একাডেমীর বার্ষিক সভায় গোটা ছয়েক বড় বড় কই মাছ এবং গোটা চারেক মুরগির রোস্ট খেয়ে বাড়ি না গিয়ে সোজা সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। আমিও সে সময় হার্টের অসুখের জন্য হাসপাতালে। আমরা চাচা-ভাতিজা পাশাপাশি বেডে। চাচা একটু সুস্থ হলে আমি ভীষণভাবে বকলাম; বললাম, এবার বাড়ি গিয়ে মুখ সেলাই করে দেব।

চাচার একটা দোষ ছিল; নাম মনে রাখতে পারতেন না। একমাত্র আমার স্ত্রীর, আমার একমাত্র বোন মশিলা ও তার মেয়ে পিয়া এবং আমার বড় ছেলে জয়ের নাম ছাড়া আর সব ভাই এবং ভাইদের ছেলেমেয়েদের নাম মনে রাখতে পারতেন না। আমার বোনের মেয়ে পিয়াকে প্রিয়া বলে ডাকতেন। বাবা আদর করে প্রিয়া নাম রেখেছিলেন; আমি রাগ করে বাবাকে বলেছিলাম, ও বড় হয়ে যখন কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে যাবে তখন ছেলেরা বেশ মজা করে ওকে ডাকবে, ওগো মোর প্রিয়া, তুমি কোথায়, তখন ওর কেমন লাগবে ভেবেছেন? তার পর থেকে প্রিয়া নাম বাদ। মাঝে মাঝে আমার অন্য ভাই বা ভাইদের ছেলেরা যদি চাচার সামনে পড়ত তখন চাচা বেশ মুশকিলে পড়তেন। চাচা চালাকি করে জিজ্ঞাসা করতেন—এই তোমার নামটা যেন কি! ভুলে যাচ্ছি, তুমি বলোতো-তখন ওরা চাচার চালাকি ধরে ফেলে বলত উল্টোপাল্টা নাম। চাচা বিভ্রান্ত হয়ে কিছু না বলে নিজের মতো চলে যেতেন।

চাচা লেখাপড়া, মিটিং আর খাওয়াদাওয়া ছাড়া সংসারের কোন খবর রাখতেন না। হয়তো লাইট চলে গেছে বা গ্যাস নেই— এসব সমস্যার কথা চাচি যদি চাচাকে বলতেন তখন চাচা সোজা বলতেন, তোমার বাবা লাকীকে বলো, ও-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তখন চাচি আমাকে ফোনে বলতেন, বাবা তোমার মেয়ে বলছি, অনেক সমস্যায় পড়েছি, তুমি এসো, লাইট নেই, তোমার চাচার লেখাপড়া বন্ধ। সব ব্যবস্থা সেরে চাচাকে বলতাম, জামাই বাবাজি এখন সব ঠিক আছে তো? জামাই বাবাজি ডাকটা চাচার খুব ভাল লাগত এবং খুশি হতেন। চাচিও গর্বের সাথে বলতেন, আমার বাবা ছিল বলে তোমার কাজ ঠিকমতো হলো, তা না হলে বুঝতে কত ধানে কত চাল! মোট কথা, আমি ছাড়া চাচা-চাচি কিছুই বুঝতেন না।

চাচার বাড়ি বিহারী ক্যাম্পের কাছে। একদিন চাচা ভোরে আমাকে ফোনে জানালেন বাবা শ্বশুর, শীঘ্র এসো, আমার বাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে বস্তি বসেছে। গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি দুটো ঘর চাটাই খলপা তৈরি হয়ে গেছে। আমি গিয়ে ওদেরকে বকে বুঝিয়ে ঘরগুলো সব সরিয়ে দিয়ে চাচাকে বললাম ওরা আর আসবে না। চাচা খুব খুশি হয়ে চাচিকে বললেন, দেখলে তোমার বাবা কত কাজের, নয়তো আমাকে পুলিশ ডাকতে হতো। বুঝলে লাকী, আজ থেকে তুমি আমাদের পাড়ার মাতবর।

টিভিতে একটা অনুষ্ঠান হতো "আইন আদালত"। তিনটে চরিত্রে ছিল দবির, খবির আর সালেহা। চাচাকে কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা চাচা এই তিন জনের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? চাচা হেসে উল্টো আমাকে বললেন, তোমার কি মনে হয়! আমিও একটু মজা করে বললাম, দবির আর খবির খুব সম্ভব আপনার কড়া মাস্টার ছিল আর সালেহা বোধ হয় আপনার ইয়ে ছিল? উত্তরে চাচা কিছুই বলতেন না, শুধু হাসতেন।

আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা; চাচা তাঁর এই অতিসাধারণ ভাতিজার নামে তাঁর লেখা "রেজিস্ট্রেশন আইনের ভাষ্য" বইটি উৎসর্গ করেন। এতেই বোঝা যায় চাচা আমাকে কত ভালবাসতেন। আমার মনে হয় চাচা তাঁর ছেলেদের থেকে আমাকে কিছু কম ভালবাসতেন না। ছোট একটা অনুষ্ঠানে তাঁর বইটা আমার হাতে তুলে দেন।

শেষ জীবনে চাচার বাঁচার জন্য ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল, বোধহয় সে কারণে চিকিৎসার জন্য বিদেশ গিয়েছিলেন। হার্টের চিকিৎসার জন্য চাচাকে অনেকবার বলি। চাচা চলেন, আমরা দু'জন যাই বিদেশে ভাল চিকিৎসার জন্য। চাচাকে নিতে পারিনি, আমি একাই গিয়েছিলাম। বাবা মারা যাবার পর চাচার ছায়া পেয়েছিলাম। পরে সে ছায়াও চলে গেল। তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাঁকে শান্তি এবং বেহেশত নসিব করেন।